অঞ্জন চক্রবর্তী

ওগো পড়োশিনী

"সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ-প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ-অপযশ পরাজয় উত্তর-প্রত্যুত্তর সমস্ত ভুলিয়া, শেখর আপনার নির্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ময়ী মানসী মূর্তি, কেবল কানে বাজিতেছিল দুটি কমলচরণের নূপুরধ্বনি।

'জয়-পরাজয়' গল্পে শেখর এমনভাবেই হাজির করেছিল রাধাকৃষ্ণের ভালোবাসা নিয়ে রচিত তাঁর গাথা যা তাঁর নিজের প্রেমভাবনার রঙে রঞ্জিত। রবীন্দ্রনাথ এমন মাটির গন্ধেই দেখে এসেছেন এই শাশ্বত প্রেমকথাকে যেখানে দুই নরনারীর ভালোবাসাই মুখ্য হয়ে ফুটে উঠছে এবং সেই উপলব্ধির সোপান থেকে গেছে কবির নিজের ভালোবাসায়। তত্ত্বগত কচকচির আব্রুতে ঢেকে এই ভালোবাসাকে শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়ায় তাঁর মন যায়নি। শেখরের গীতি উপস্থাপনার পাশেই পুণ্ডরীকাক্ষের আস্ফালনের জয়জয়কার তাই চূড়ান্ত শ্লেষের সঙ্গেই উপস্থাপনা করেন তিনি ঃ

রাজা পুণ্ডরীকের আশ্চর্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না এবং কৃষ্ণরাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশির গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল; যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সবুজ রঙটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল।

রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমকে 'পবিত্র গোময়' লেপন করে দেখার কোনো অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কাজ করেনি। চণ্ডীদাস তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কবি, কিন্তু তাঁর চণ্ডীদাসের ধারায় সহজিয়া সাধনায় অবতীর্ণ হন নি তিনি। তাই 'স্বকীয়া' শব্দে সকাম সাধনা এবং পরকীয়া শব্দে নিষ্কাম সাধনা (সহজিয়া সাহিত্য : মনীন্দ্রমোহন বসু)—এই সমীকরণে তাঁর আগ্রহ নেই। 'নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি ভাবিনী ভাবের দেহা' – বিশুদ্ধ পরকীয়া প্রীতি সম্পর্কে চণ্ডীদাসীয় সংকেত রবীন্দ্রনাথকে কোনো ছকের মধ্যে টানেনি। তবু তিনি খুঁজে নেবেন পরকীয়া প্রেমের নিহিত 'ঐশ্বর্য' চণ্ডীদাসের কাছ থেকে, সেখানে নিয়ে আসবেন তাঁর আরেক প্রিয় কবি দান্তেকে। চণ্ডীদাসের প্রীতি রজকিনী রামীর সঙ্গে, দান্তেও ভালোবাসেন পরস্ত্রী বিয়াত্রিচেকে। 'পবিত্র গোময়ের' বদলে রবীন্দ্রনাথ আনলেন বিরহবোধকে যা তাঁর কাছে প্রেমকে Sublimity-র পথে নিয়ে যাবার চালিকাশক্তি ঃ

"বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণ চন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি সেখানে তাকে ডেকে বলছে ঃ

তুমি বেদবাদিনী, হরের ধরণী
তুমি সে নয়নের তারা–

সেখানে রজকিনী রামী কোন্ দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই। হোক-না সে নয়নের তারা তবুও যে নারী বেদবাদিনী, হরের ঘরণী, সে আছে বিরহলোকে। (যাত্রী)

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে বিরহই পরকীয়া প্রেমকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। কলুষ ও আবিলতা এসে লাগলে রবীন্দ্রনাথ তাকে বিচ্যুতি হিসেবেই দেখিয়েছেন, প্রেম হিসেবে তাকে আর দেখা যায়নি। অন্যদিকে তার পরকীয়া প্রেমিকরা 'devotion to something a far'-এর সৌন্দর্যে নিবিষ্ট হয়ে উতলপ্রাণে আকাশ পানে হৃদয়খানি তুলি বীণায় গান বেঁধেছেন নিজের সাধ্যমতো। নিকটে থাকাও যেখানে 'অতিদূর আবরণে রয়েছে ঢাকা'। সেই সঙ্গে অহেতুক, অমানবিক আত্মদমনকেও চোখের ভুলে বড়ো করে দেখেননি তিনি। ...

'আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাইনা। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করছি মাত্র। আপন মনে যে সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনা সংগত। রামলোচনের গৃহভিত্তিক আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা অত্যন্ত অসংগত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।'

'এক রাত্রি' গল্পের কথক যেন স্বদেশি যুগের নেতাদের এক ক্ষুদ্র কৌতুকাবহ প্রতিরূপ যে অন্তত আদালতের হেডক্লার্ক হতে চেয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসে 'মাটসীনি গ্যারিবালডি' হবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তৎকালীন নেতারা অনেকেই যে আইন অথবা প্রশাসনের উচ্চ উৎকর্ষতায় অগ্রসর হয়েও শেষে দেশহিতে নিবেদিত হয়েছিলেন একথা কে না জানে! সে সময়কালের আরেক ভাবনাস্রোত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে কৌমার্যকে স্বদেশব্রতের আবশ্যিক উপাদান করে তোলা যাকে রবীন্দ্রনাথ 'চিরকুমার সভা'য় পরিহাসচ্ছলে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। 'চিরকুমার সভা'য় 'শেষরক্ষা' হলেও অনেকের জীবনেই এই ভাবনাস্রোত ট্রাজেডির কারণ হয়ে উঠতে পারে। কথক তাই স্বদেশহিতে নিমজ্জিত হয়ে সুরবালাকে বিবাহের প্রস্তাবকে তুচ্ছ জ্ঞান করে উড়িয়ে দেন। সুরবালার বিবাহ হল রামলোচন উকিলের সঙ্গে, 'পতিত ভারতের' জন্য চাঁদা আদায়ে ব্যস্ত কথকের কাছে এটি নিতান্ত সামান্য সংবাদ হিসেবেই এল।

কিন্তু বিধি বাম! ফাস্ট আর্টস দেবার আগেই পিতার মৃত্যু হল এবং কলেজ ছেড়ে এন্ট্রেন্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারিকে বেছে নিতে নয়, জাপটে ধরতে হল বাঁচার তাগিদে ঃ

আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে লেজ মলা খাইয়া নতশিরে, সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটি-ভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় এক পেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে; লম্ফে ঝম্ফে আর উৎসাহ থাকে না।

এই নিষ্ঠুর আত্মোপলব্ধির মধ্যেই শেষ হল স্বদেশি আন্দোলনের burlesque, শুরু হল প্রকৃতির প্রতিশোধ। যে সুরবালাকে একদিন হেলায় দূরে ঠেলেছিল আজ তার 'মৃদু একটু চুড়ির

টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খসখস' এবং 'মাথাঘষার গন্ধ' পাগল করে তুলল তাকে। আজ সে প্রতিবেশী রামলোচন উকিলের গৃহিণী, তার আবাস বিদ্যালয় গৃহের নিকটেই। যে অনায়াসেই তার হতে পারত আজ সে অন্যের স্ত্রী, চোখের সামনে বাস্তবের এই রূঢ়তা আজ মানতে হচ্ছে তাকে। অথচ সুরবালার বদলে অন্য কারুর সঙ্গে রামলোচনের বিয়ে হলে কিছুই তারতম্য হত না। তবু বিরহের অনলে উদ্ভাসিত প্রেমভাবনা পাঠকের কাছে রামলোচন উকিলের দাম্পত্য যাপনের গতানুগতিকতার তুলনায় এক ভিন্নমাত্রা এনে দেয় ঃ

দিব্য পাঁচ টাকা রোজগার করিতেছে – যেদিন দুধে ধোঁয়ার গন্ধ হয় সেদিন সুরবালাকে তিরস্কার করে, যেদিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটাসোটা, চাপকান-পরা, কোনো অসন্তোষ নাই; পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোনো দিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যা যাপন করে না।

পুকুরের ধারে হাহুতাশ করে সন্ধ্যা যাপন আপাত কৌতুকাবহ হলেও বিরহীর উপলব্ধির 'ঐশ্বর্যে' উজ্জ্বল। অবশেষে এল সেই প্রলয়ের রাত। Browning বিরহীর বচনে 'The Last Ride Together' এ লিখেছেন -Who Knows the world may end today. রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঝুলন' কবিতায় মরণদোলায় রশি বেঁধে ভালোবাসার মানুষের কাছে বসে ঝড়ের দোলায় দুলতে চেয়েছিলেন। প্রলয় বাহ্যিকভাবে কাছে এনেছিল সুরবালা আর কথককে, ঘটনাচক্রে রামলোচন সেদিন ঘরে নেই। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তাদের বিচিত্র এই অভিসারে মুহূর্ত অনন্তরূপ পেল (instant made eternity)। মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে মন্ত্রোচ্চারণের মতো তার প্রেমিকার মঙ্গল কামনা করে গেলো। এই রাতটুকু তার সামান্য জীবনের অমূল্য সম্পদ। এই প্রাপ্তিই তার অন্তরাত্মাকে বলাবে - আর কিছু না চাই।

"ভূপতির কাজ করিবার কোনো দরকার ছিল না। তাহার টাকা যথেষ্ট ছিল, এবং দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশত তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির হইতে হইল। ইহার পরে সময়ের দীর্ঘতার জন্য তাঁহাকে আর বিলাপ করিতে হয় নাই।"

গরম দেশে গরম সম্পাদনার কাজে নিবিষ্ট আরেক দেশব্রতী মানুষের আঙিনায় পা রাখলাম আমরা যাঁর অন্দরমহলে 'ফল পরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার' মধ্যে তার বালিকা স্ত্রী যৌবনে পদার্পণ করছেন। 'ভারত-গবর্মেন্টের সীমান্ত নীতি' তাঁর 'প্রধান লক্ষের বিষয় ছিল'। দাম্পত্য লীলার সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু 'চারুলতার সে সুযোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল। ফল যা হবার তাই হল ঃ

যে সময়ে স্বামী-স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণ-প্রভামণ্ডিত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের

কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।

ভালো মানুষ ভূপতি অবশ্য আত্মীয়ার ভর্ৎসনায় সাড়া দিয়ে শ্যালক উমাপতির স্ত্রী মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়ে চারুর 'সঙ্গিনী'র ব্যবস্থা করলেন। ওদিকে চারুর একটি সঙ্গীর বন্দোবস্তও কিন্তু হয়ে গেছিল। ভূপতির পিসতুতো ভাই অমলকে ধরে পড়া বুঝে নেয় সে। অন্যদিকে বৌঠানের কাছে অমলের আবদারের অন্ত নই। কখনও পশমের জুতো, কখনও গলাবন্ধ, কখনও ফুলকাটা পাড় যুক্ত রেশমের রুমাল। এছাড়া আছে বিলাতি আমড়াগাছ যুক্ত বাগান নিয়ে নানা পরিকল্পনা। 'আকাশ কুসুমের চয়ন' থেকে শুরু হয়ে গেল কাব্যকুসুমের চাষ। চারুর উৎসাহে অমলের লেখার নেশা চাপলো, লাগলো লেখা শুনিয়ে চমৎকৃত করার নেশা ঃ

সেদিন সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল; সাকী ছিল, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহ্নের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল। বৌঠানের সান্নিধ্যে কিশোর দেবরের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ আমাদের খোদ গল্পকারের প্রস্ফুটনের ইতিকথা মনে করিয়ে দেয়। কাদম্বরী নামটির মধ্যেই মদ্যের অর্থ নিহিত, অমলের সাহিত্য মাদকরস পান সেই বিশেষ অনুষঙ্গের ব্যঞ্জনাই যেন এনে দেয়। বিহারীলাল সম্পর্কে বউঠানের মুগ্ধতা ঈর্ষান্বিত করত রবীন্দ্রনাথকে। মন্মথ দত্ত সম্পর্কে ঈর্ষার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হয়তো রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কোনো চাপা কৌটোর মুক্তি। 'ভোরের পাখি'র কত স্পষ্ট প্রতিধ্বনি মন্মথ দত্তর 'সন্ধ্যার পাখি' যা বউঠানকে খুশি করার জন্য নিয়ে আসে অমল।

যাইহোক, কাব্যকুসুম চাষের এই নন্দনকাননে মন্দার উপস্থিতি যেন প্ররোচক সর্প। অমলের মন্দাকে প্রশ্রয়দানে চারুর অসূয়া যেন অমলের প্রতি তার সজীব আকর্ষণকেই মুক্তভাবে প্রকাশিত করতে থাকে। এ যেন হঠাৎই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া। অমল মন্দার নির্বাসনদন্ডকে নিজের নির্বাসনের ইঙ্গিত হিসেবে নিতে থাকে। সে চায় বউঠানকে কটা কড়া কথা শুনিয়ে দিতে। কিন্তু এর মধ্যে এসে দাঁড়ায় সংসার অনভিজ্ঞ ভূপতির প্রবল বঞ্চনার শিকার হওয়া। আশ্রয়দাতা দাদার প্রতি সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা প্রবলভাবে জেগে ওঠে তার মধ্যে। চারুর কাছে এসে পৌছবার অব্যহিত পূর্ব মুহূর্তে দেখা হয় ভূপতির বিবর্ণ মুখের সঙ্গে। ঝগড়ার বদলে তার উচ্চারণে আসে উদবিগ্ন কৌতুহল – বউঠান, দাদার কী হয়েছে বলো দেখি। চারু কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দেয় না এ-বিষয়ে। তার তখন অমলকে তার নতুন লেখা 'অমাবস্যার আলো' দেখানোর আগ্রহ। অমল বুঝি চারুর মুখে পড়তে পারল তার প্রতি ভালোবাসার অক্ষর যা স্বামীর বিপন্নতায় বিঘ্নিত নয় আর সেই আয়নায় বুঝি দেখতে পেল নিজের গোপন আসক্তির প্রতিচ্ছবি ঃ

[পর্বত পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল। না, তার স্নেহময়, ভালো মানুষ দাদার ঘরটিকে 'কাব্যের নীড়' বানানোর নামে 'নষ্টনীড়' হতে দেবে না সে। পলায়ন তথা অবদমনের সুযোগ এসে পড়ে তার হাতে এবং সে তাকে জাপটিয়ে ধরে। বিয়ে এবং কনের বাড়ির টাকায় বিলেতে পড়াশুনোর সুযোগ তাকে 'নৈতিক সংকট' থেকে উদ্ধার করে। ক্রমশ দূরত্ব তৈরি করতে সক্ষম হয় চারুর থেকে। ফিরে এসে দাদার পাশে দাঁড়ানোর ব্রত নেয়।

অমলের এই মহত্তে উত্তরণ কিন্তু ভূপতির ঘরকে 'নষ্টনীড়' হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না।

চলে যাবার পর অমলের আশ্চর্য নীরবতায় দগ্ধে মরতে থাকে চারু ঃ

এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না, তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা সজ্জিত একটি গোপন শোকের–মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর কাহারও কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেখানে গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে যে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশ আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

অমল তাই চারুকে একটি "রুদ্ধগৃহ" নির্মাণ করতে বাধ্য করল মাত্র। ভূপতির চারুর কাছে ক্রমাগত আত্মনিবেদনের আর্তি হঠাৎ জ্বলে ওঠে লেখার খাতা পুড়িয়ে দেবার আগুনে। অনুতপ্ত ভূপতি হাত বাড়ায় আবার, বলে 'এসো'। চারু বলে–না, থাক।

অমলের উত্তরণ আসলে কোনো উত্তরণ নয়, অবদমন ও পলায়নের সমন্বয় মাত্র। রবীন্দ্রনাথ উত্তরণে বিশ্বাসী, অবগাহনে বিশ্বাসী, রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতন সন্ধানই তাঁর ব্রত। অমলের কাছে থেকেও বিরহ লোক নির্মাণের ক্ষমতা নেই । নেই দিবস রজনী পরবশো থাকিব, অথচ প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া দিব"র চন্ডীদাসীয় প্রত্যয়। তাই এক গহ্বর থেকে বাঁচবার অছিলায় সকলকেই আরেক অতলগহবরে তলিয়ে যেতে দেয়।

"পয়লা নম্বর" গল্পের অদ্বৈত ছিল ফেল করা ছেলে। অধ্যাপক বা পণ্ডিত নয়। তবু সে টেনিসনকেও বিচার করতে ডরায় না, হাক্সলি-ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যায় নি। পুস্তকপাঠ ও আলোচনার নেশায় তার চারপাশে জড়ো হয় দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়' যাদের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভোজনরসেও প্রবল আসক্তি। তাদের ভোজনের ব্যবস্থা করতে হয় স্ত্রী অনিলাকে। যতদিন এরা জোটেনি ততদিন আলোচনার শ্রোতা সে একাই ছিল। এরপর তার ভূমিকা নিতান্তই হেঁসেলকর্মীর। অনিলার নামের তাৎপর্যের মতো অনিলার তাৎপর্যও অদ্বৈতের কাছে অনাগ্রহের বিষয় ছিল। তার পিতৃহীন ছোটোভাই সরোজ সম্পর্কে জ্ঞানদানের উৎসাহ ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি কাজ করেনি তার। এহেন অনিলার প্রেমে পড়ল দুর্বার ধনী সিতাংশুমৌলি – সেই সিতাংশু যার সংগীত ও টেনিস খেলার আয়োজন অদ্বৈতের "সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া' ভেঙে দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়ের মানুষকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছিল তার দিকে। প্রাব্যলাতিশয্যের চটক ও চমকে ভরপুর সিতাংশুর চিঠিতে বেজেছিলো এক আশ্চর্য নম্রতার সুর, নিবেদনের আর্তি, মুগ্ধতা ঃ

আমার যা পাবার তা পেয়েছি, আর কিছু চাইনে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম।

ভূপতি আর চারুর মাঝখানে ছিল খবরের কাগজ। অদ্বৈত আর অনিলার মাঝখানে গ্রন্থালোচনা। সিতাংশু অনিলাকে এনেছিল জানলার সামনে। তবু আগুন জ্বলেছিল। অনিলা পালাতে চেয়ে স্বামীকে বলত বাসা বদলের কথা। ওদিকে সিতাংশুও লিখেছিল ঃ

ইচ্ছে করে, স্বর্গমর্তের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমার আমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে

উদ্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয়, আমার দুঃখই তোমার অন্তর্যামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই।

অনিলা নেই, ওদিকে সিতাংশুও চলে গেছে– এমন অবস্থায় অদ্বৈতের মনে হয় ফ্লোবেয়ার, টলস্টয়, তুর্গেনিভের গল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটল তার ঘরে। পয়লা নম্বরের চিঠি যা রেশমের লালফিতেয় বাঁধা অবস্থায় রেখে গেছে অনিলা তা হয় উঠল তারও চিঠি। সিতাংশুর সঙ্গে মসূরি পাহাড়ে দেখা হবার পর সে টের পেল দুজনেরই সম্বল নীল রঙের চিঠির কাগজের দুটি টুকরো যার বয়ান একই – আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না। বৈধ স্বামী ও অবৈধ প্রণয়ীর জন্য একই নিবেদন রেখে গেছে অনিলা। 'বৈষ্ণবকবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন – দেবতারে যাহা দিতে পারি, তাহা দিই প্রিয়জনে। গ্রন্থকীট, উদাসীন, আত্মভোলা 'পতিদেবতা' আর প্রবল রোমান্টিক প্রণয়ীকে এইভাবে মিলিয়ে দিল অনিলা। অন্যদিকে সিতাংশুর চিঠিকে অদ্বৈত আত্তীকৃত করায় স্বকীয়-পরকীয় একাকার হয়ে গেল। বিচিত্র সুষমা।

তোমার সহিত সাক্ষাতের দুরাশা আমার নাই এবং অন্তর্যামী জানেন, তোমার গার্হস্থ্য সুখের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশ করিবার দুরভিসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্তী একটি গ্যাসপোস্টের তলে আমি সূর্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি ঠিক সাড়ে সাতটার সময় একটি প্রজ্জ্বলিত কেরোসিন-ল্যাম্প লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত তোমাদের দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর, সেই সময় মুহূর্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দৃষ্টি পথে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।

আবারও একটি চিঠির অংশ পড়লাম আমরা, লেখক শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার। "ডিটেকটিভ" মহিমচন্দ্রের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে এই চিঠি। 'একরাত্রি' গল্পের শিক্ষক যেমন সুরবালার সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব হেলায় উড়িয়ে দেশনায়ক হতে চেয়েছিল ও পরে পরিতাপ করেছিল মন্মথর ইতিহাস তেমনটি নয়। যে 'লজ্জার মাথা খাইয়া' 'বিবাহের সম্বন্ধ চেষ্টা' ও করেছিল, কিন্তু বয়স প্রায় এক হওয়া উভয়পক্ষের কর্তারা কোনোক্রমে রাজি হননি। মহিমচন্দ্র শুধু পেশায় নন, নেশাতেও ডিটেক্টিভ। তাই সহজে অপরাধী ধরে ফেলায় তাঁর মন ভরে না, তিনি রাস্তাঘাটে অপরাধী খুঁজে বেড়ান। সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি অগাধ আস্থা তাঁকে আরো সন্দেহ ব্যবসায় ঠেলে দেয়, অন্যদিকে স্ত্রী জানিয়ে রাখেন সাধারণ মানুষ হিসেবে সন্দেহ তাঁর স্বভাব এবং সুযোগ এলেই তার ব্যাপ্তি ঘটবে। এবং ঘটলও। এ ঘটনা চক্রে মন্মথ ও তার একসময়ের খেলার সাথী ও প্রণয়িনীকে দেখতে পেয়ে তাঁরই ঘরের কাছে গ্যাস পোস্টের নীচে দাঁড়াতে শুরু করল। তাঁর মাথায় চাপে অভিসন্ধি বের করার অভিপ্রায়। ছাত্র সেজে মন্মথর বাসায় ঢুকে গর্হিত ভালোবাসার গল্প ফেঁদেও কিছু বের হল না যখন তখন রঙ্গমঞ্চে আনা হল পেশার প্রয়োজনে ব্যবহৃত নারী হরিমতিকে যার প্রণয়ে মহিম উন্মাদ। এবং ওই চিঠির অন্য অংশের সৃষ্টি হল ঃ

সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পালকি করিয়া একবার বিশ-মিনিটের জন্য আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগুলি গোপনকথা বলিতে চাহি, এবং

সেই সঙ্গে কতকগুলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি, আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমতো চলিলে তুমি একদিন সুখী হইতে পারিবে।

তবে শুধু হিতৈষণা নয়, "ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব এবং তোমার চরণতল স্পর্শে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্য সুখস্বপ্নমণ্ডিত করিয়া তুলিব, এ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তরে আছে।"

ভূপতির কাগজ, অদ্বৈতের গ্রন্থগুলতানির মতো মহিমচন্দ্র আর স্ত্রীর মাঝখানে দাঁড়িয়েছে রহস্যনেশা। ওদিকে বাল্যপ্রণয় এসে দাঁড়িয়েছে গ্যাসপোস্টের তলায় 'সূর্যোপাসকের ন্যায়।' মহিমচন্দ্র অজান্তে 'কেস' হিসেবে সংগ্রহ করে বসিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীর মুখোমুখি। মহিম দেখলেন আড়ষ্ট অবগুণ্ঠিত নারী। 'মন্মথর কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন'। মন্মথর চিঠির ভিত্তিতে ডিটেকটিভের সিদ্ধান্ত তাদের সম্বন্ধ সমাজ বিরুদ্ধ 'না হইবারই সম্ভব'।

আমাদেরও তাই।

কিন্তু সমাজবিরুদ্ধ সম্পর্কের রেশও চলে আসে। আনন্দী বোষ্টমীকে পৃথিবীর দুটি মানুষ সবচেয়ে ভালোবেসেছিল। একজন তার ছেলে যার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে জলে ডুবে। এইভাবে সে তাকে ছেড়ে চলে যায়। অন্যদিকে সেই ছেড়ে চলে যায় তার স্বামীকে। কিন্তু কেন?

আনন্দীর স্বামী সহজ, সরল মানুষ। কিন্তু আঁধারে এক একদিন তাঁর মুখে এক আধটা কথা শুনে হঠাৎ বোঝা যায় সরল মানুষটির এক অনায়াস প্রজ্ঞা আছে। ছেলেবেলায় খেলার সাথি আবার তার জীবনে যখন গুরু হিসেবে দেখা দিলেন তাঁর ভক্তি উথলে উঠল। সেই ভক্তের চোখ দিয়েই তিনি গুরুকে অনুরোধ করলেন সন্তান বিয়োগে ব্যথাতুর স্ত্রীকে শাস্ত্রোপদেশ দেবার জন্য। শাস্ত্র থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল শাস্ত্রোপদেষ্টা। "গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল" আর তাই একদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাবার ছায়াপথে একদিন গুরুঠাকুর আনন্দীর সিক্তবসনা সৌন্দর্য দেখে তার মুখের 'পরে দৃষ্টি রেখে বললেন "তোমার দেহখানি সুন্দর।"

আনন্দী তারপর ঠাকুরঘরে গিয়ে আর ঠাকুরকে দেখতে পেল না। ঘুমের ঘোরে একবার স্বামীর ছুড়ে দেওয়া পা সে বুকের রতন হিসেবে নিল। তারপর সংসার ত্যাগ করল। তার ভালোবাসা নারায়ণ, মিথ্যা সইতে পারল না। চিঠিপত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লেখেন "বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় অল্প কিছু বদল করেছি। বোষ্টমী যে গুরুকে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয় – সংসার ত্যাগ করেছিল বটে। সত্যের উপর এই রিপুকর্ম রবীন্দ্রনাথ করেছেন তাঁর শৈল্পিক সূক্ষ্মতার প্রয়োজনে। যে অনুরক্তি শরীরসর্বস্ব তা প্রেম না। চোখ দুটোকে অতল সুধাসাগর তলে ডুবিয়ে দেবার সামর্থ্য সেখানে নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রেম পদবাচ্যে ফেলেন নি।

'উদ্ধার' গল্পে সুন্দরী পালিতা কন্যা গৌরী পরেশের সন্দেহপরায়ণ গৃহস্থালিতে সন্তুষ্ট ছিল না। তাই গৌরীর অন্তরের সমস্ত ব্যর্থ স্নেহ প্রেম কেবল ভক্তি আকারে পুঞ্জীভূত হইয়া গুরুদেবের পদতলে সমর্পিত হইল"। সাধু পরমানন্দকে সকলেই চরিত্রবান বলেই জানত, কিন্তু পরেশের

স্বভাবদোষ তাঁকে জড়িয়েও কুৎসা রটাতে ছাড়াল না। অন্যদিকে গৌরীর প্রতিবাদী জিদ বাড়তে থাকে। সে পরমানন্দকে সংসারযন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের জন্য আকুল প্রার্থনা জানায়। পরমানন্দ তখন ভর্ৎসনা করে তাকে ফেরত পাঠালেও "অকস্মাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন অধ্যায়সূত্র' আর তেমন করে জোড়া লাগে না। পরেশের শহরময় কুৎসা রটনা তাঁকে নগরত্যাগে বাধ্য করে। সেইসঙ্গে জাগে উৎপীড়িতকে উদ্ধার করার বাসনা; সন্ন্যাসীর এই কয়দিনকার দিনরাত্রের ইতিহাস কেবল অন্তর্যামীই জানেন'। তাই গৌরীকে ২৬ ফাল্গুন বুধবারে অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় পুষ্করিণী তীরে দেখা করার আহ্বান চিঠির আকারে অবরোধের মধ্যে গৌরীর কাছে এসে পড়লো এবং গৌরীও পত্রখানি কেশে বাঁধিয়া খোঁপার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল'। কিন্তু সে-চিঠি খোঁপার আগল খুলে এসে পড়ল পাষন্ড স্বামীর হাতে। আপোপ্লেক্সিতে আক্রান্ত হয়ে মুত্যু হল তার। অন্যদিকে সন্ন্যাসী অভিসারমত্ত, খবর রেখেছিলেন পরেশের জরুরি মোকদ্দমা ছিল মফস্সলে। তাই হাজির হলেন যথাসময়ে, যথাস্থানে। গৌরী তাঁর পতনের ছবি চোখের সামনে দেখতে পেল, তাই পাষন্ড সদ্যমৃত স্বামীর পাশে বিষপান করে শুয়ে পড়া অনেক উঁচু থেকে নীচে নেমে আসা সন্ন্যাসীর সঙ্গে 'কৃষ্ণপ্রেমে সংসার ত্যাগ' করার থেকে শ্রেয় মনে হল। 'আসিতেছি, গুরুদেব' তাই মনের মন্দিরে স্থাপিত গুরুর উদ্দেশে যাত্রা, মরণ তারই সেতু। পতিত গুরু তার নাগাল পায় না।

শেষ করব 'ল্যাবোরেটরি' গল্পে সোহিনীর উক্তি দিয়ে। ল্যাবোরেটরিতে যেমন ঢেলে, মিশিয়ে, ফুটিয়ে, থিতিয়ে তৈরি হয় নানা আবিষ্কারের বস্তু, রবীন্দ্রনাথ তেমন করেই বানিয়েছেন সোহিনীকে। নিজেই বলেছেন – আমি ইচ্ছা করেই তো করেছি। সোহিনী মানুষটা কীরকম, তার মনের জোর, তার লয়ালটি, এই হল আসলে বড়ো কথা। তার দেহের কাহিনি তার কাছে তুচ্ছ। (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। কবি-কথা বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫০) সব ভন্ডামিকে ভাসিয়ে অধ্যাপকের কাছে নিজের অন্তর মেলে দেয় সোহনী ঃ

ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতা সাবিত্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধুরী মশায়, মনে রাখবেন, ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেননি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরেনি।

পরকীয়-অনায়াস হয়ে ও সোহিনীর মনে জেগে থাকে তাঁর স্বামীর প্রাণকেন্দ্র 'ল্যাবরেটরি'র প্রতি অসীম নিষ্ঠা যা অন্তহীন। ল্যাবরেটরিতে জ্বলতে থাকা হোমের আগুন প্রাণে ধরে সে জ্বালে তার দেবালয়ের প্রদীপ। বাহ্যে সে 'কুন্তী- দৌপদী', অন্তরে সে "সীতা-সাবিত্রী"!